এই সময়

মানবজমিন

হকার সংগ্রাম কমিটির মুখপত্র

প্রথম বর্ষ ।। তৃতীয় সংখ্যা ।। সেপ্টেম্বর ২০২৫ ।। বিনিময় ১০ টাকা

শক্তিমান ঘোষের সম্পাদকীয়

১৯৮৫-তে সুপ্রিম কোর্টে ওলগা টোলিস বনাম বোম্বে মিউনিসিপাল কর্পোরেশন নামে এক ঐতিহাসিক মামলা হয়েছিল। এই মামলায় প্রথমবার বলা হয়েছিল হকারি করা মানুষের অধিকার। এই মামলার রায়ে সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৯ (জি) এবং ২১ একসাথে যুক্ত করে জীবনের সাথে জীবিকার অধিকার বলে ঘোষণা করা হল। অর্থাৎ এবার থেকে হকারি করা মানুষের মৌলিক অধিকার হিসেবে গণ্য হল। তবে এর সাথে নিয়ন্ত্রণের শর্তও ছিল- উচ্ছেদ নয় বরং নিয়ন্ত্রণ এবং নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে।

১৯৯৬-তে নির্বাচনের ঠিক আগে কলকাতায় অপারেশন সানশাইন নামে একটি বড় উচ্ছেদ অভিযান চালানো হয়। সরকারের পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হয় ১৩ ডিসেম্বরের পর পশ্চিমবঙ্গের ফুটপাথে একজনও হকার থাকবে না। আমি যদি ফুটপাথ থেকে হকার উচ্ছেদ না করতে পারি, তাহলে মন্ত্রীত্ব ছেড়ে দেব বলেছিলেন সুভাষ চক্রবর্ত্তী, তৎকালীন বামফ্রন্টের পরিবহন মন্ত্রী।

আমরা বুঝেছিলাম, হকারদের ওপর একটা বড় আক্রমন নামতে চলেছে। তাই আগষ্ট মাসে আমরা পশ্চিমবঙ্গের ৩৬টি ইউনিয়নকে একত্র করেছিলাম শুধু সি আই টি ইউ বাদে, কারণ তারা বলেছিল, বামফ্রন্ট সরকার হকার উচ্ছেদ করবেনা। তাদের বিশ্বাস ছিল পার্টির ওপর, সরকারের ওপর। কিন্তু ওদের এই ভাবনাকে আমরা গুরুত্ব দিইনি বিশ্বাসও করিনি। আমরা আক্রমন প্রতিহত করার প্রস্তুতি শুরু করি। কর্মসূচির অঙ্গ হিসাবে এই সময় কলকাতার প্রায় প্রতিটি রাস্তায় হকাররা তাদের পরিবার সহ রাত

জেগে দোকান পাহারা দিত। হাতে থাকত লাঠি, মাথায় হেলমেট। আমরা বলেছিলাম কোনও বোমা বা সহিংস অস্ত্র ব্যবহার করা যাবেনা। কিন্তু লড়াই এমন হতে হবে যাতে পুলিশ এক ইঞ্চিও অগ্রসর হতে না পারে।

সরকার যখন হকারদের রাস্তা থেকে সরিয়ে দেবার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হল, তখন সংবাদামাধ্যম আমাদের কাছে উপস্থিত হয়ে বারবার প্রশ্ন করতে লাগল আপনাদের পরবর্তী পদক্ষেপ কি হবে। প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলাম সরকারের হাতে পুলিশ আছে, রাপিড একশন ফোর্স আছে, পার্টির ক্যাডার আছে আমাদের কাছে মানুষ আছে, আমাদের বিশাল সংখ্যক ক্রেতা আছে। যতক্ষণ শরীরে একবিন্দু রক্ত আছে ততক্ষণ এক ইঞ্চি জমিও আমরা ছেড়ে দেবো না পুনর্বাসন ছাড়া। এরপর আমরা দেখলাম, আমাদের আন্দোলনের চাপে পড়ে সরকার কিভাবে মিথ্যের আশ্রয় নিল। সরকারি ঘোষণা ছিল ২২শে নভেম্বর একটিও হকার উচ্ছেদ হবে না। অথচ ২৪ নভেম্বর অতর্কিতে রাত ১২টায় ১ লক্ষ হকার উচ্ছেদের জন্য ১০০০০ ফোর্স নিয়োগ করা হল। যে ফোর্সের মধ্যে থাকা পুলিশ, র‍্যাফ, পার্টির ছেলেরা হাতে কর্পোরেশনের ব্যাচ লাগিয়ে বন্দুক পিস্তল নিয়ে শহরের সবচেয়ে দরিদ্র মানুষের ওপর ঝাপিয়ে পড়ে। ভেঙে ফেলা হয়, লুঠ করা হয় হকারদের সব জিনিষপত্র। তাদের শেষ সম্বলটুকু কেড়ে নেওয়া হয়। গ্রেপ্তার করা হয় হকার এবং হকার নেতাদের। আক্রমন শুরু হয় উত্তর কলকাতার হাতিবাগান, দক্ষিণের গড়িয়াহাট এলাকায়। দোকানপাট মুহুর্তে ভেঙে দেওয়া হয়; পরিস্থিতি ছিল একেবারে সামরিক অভিযানের মত। সেদিন রাতেই যেখানে যেখানে হকারেরা প্রস্তুত ছিল সেখানে পুলিশ ও প্রশাসনকে ঘিরে লড়াই হয়। শত চেষ্টাতেও আন্দোলন অহিংস থেকে সহিংস আন্দোলনে পরিণত হয়নি। সেদিন রাতে ক্ষিপ্ত হকার জনতা বিভিন্ন জায়গায় ট্রাম বাসে আগুন ধরিয়ে দেয়। চোখের সামনে তাদের সারা জীবনের পুঁজি ও ভবিষ্যত তাদের একমাত্র অবলম্বন সম্পদ দোকান লুঠ করতে দেখে, ভেঙে ফেলতে দেখে তখন নিজেদের আটকে রাখার মত পরিস্থিতিতে তারা ছিলেন না। এরপর সেই লড়াই শুধুমাত্র হাতীবাগান এলাকার সীমাবদ্ধ ছিল না, সেটা ছড়িয়ে পড়ে বৌবাজার, কলেজ স্ট্রিট, ব্রাবোর্ন রোড, শিয়ালদা, কালীঘাট লেকমার্কেট, টালিগঞ্জ, বালিগঞ্জ, গড়িয়াহাট, গোলপার্কের বিভিন্ন অঞ্চলে। এই নির্মম আক্রমনের পোষাকি নাম দেওয়া হল অপারেশন সানশাইন। আমরা প্রশ্ন তুলেছিলাম এটা সানশাইন না সানসেট। কারণ একমাসের মধ্যে ১৮ জন হকার আত্মহত্যা করে, প্রায় ১০০জন হকার বিনা খাদ্যে বিনা চিকিৎসায় মারা যায়। ঐ সময় বিভিন্ন দেশ থেকে সাংবাদিক, পলিটিক্যাল অ্যানালিস্ট, বুদ্ধিজীবিরা জড়ো হন। তাদের প্রশ্ন ছিল লাল ঝাণ্ডা হাতে নিয়ে বামপন্থী সরকার কি করে এই উচ্ছেদ কতে পারল। ওই রাতে বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায় আমাদের সাথে ক্যাম্প করে উচ্ছেদের বিরুদ্ধে পাশে দাড়ান। ফলে সেই এই আক্রমন বন্ধ করে উত্তর কলকাতায় আক্রমন চালানো হয়। আমাদের কাছে এই খবর আসার সাথে সাথেই আমরা এবং মমতা বন্দোপাধ্যায় রাতে ছুটে যাই হাতীবাগান অঞ্চলে। ততক্ষন সে অঞ্চল শ্মশানে পরিণত করে দিয়েছে পুলিশ-প্রশাসন। যার নেতৃত্বে এই অভিযান হয়েছিল, মাননীয় কান্তি গাঙ্গুলি মহাশয়, তিনি বিশাল ফোর্স নিয়ে হাতীবাগানের দিকে এগোচ্ছিলেন, যেন মনে হচ্ছিল কার্গিল যুদ্ধে যাচ্ছেন। এই পুরো পরিকল্পনার নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন প্রয়াত সুভাষ চক্রবর্তী। এই সময় মমতা বন্দোপাধ্যায় সহ সুব্রত মুখোপাধ্যায় সৌগত রায় এবং আরোও অনেকে প্রতিবাদের প্রতীক হিসাবে নিজেরা হকার সেজে আমাদের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। লড়াই এমনভাবে চলেছিল যে, যারা ভেবেছিল সব শেষ করে দেবে, তারাই চাপে পড়ে যায়।

[এরপর আগামী সংখ্যায়]

ক্রোনি ক্যাপিটালিস্ট, ধনীদের ওপর কর চাপাও, জনসাধারণের ওপর করের বোঝা আরও কমাও

অত্রি ভট্টাচার্য

ভারতে ক্রোনি ক্যাপিটালিজম বা 'স্বজনপোষণের পুঁজিবাদ' যে ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে, তা নিয়ে কর্পোরেট জগতের প্রবল সন্দেহ থাকলেও জনগণের কাছে এটা খুল্লমখুল্লা তথ্য। গত এক দশকের বেশি সময় ধরে বড়ো ব্যবসায়িক কর্পোরেট গোষ্ঠীরা রাজনৈতিক যোগসাজশে দেশের সম্পদ লুঠের শীর্ষে পৌঁছেছে এবং একই সঙ্গে সরকারী নীতিনির্ধারণ প্রক্রিয়ায় নিজেদের সক্রিয় নিয়ন্ত্রণ ক্রমশঃ বাড়িয়ে চলেছে। হঠাৎ করে কোভিড লকডাউন ডাকায় যখন কোটি কোটি ভারতীয় বেকারত্ব, ক্ষুধা ও আর্থিক সংকটে পড়েছিলেন, কয়েক কোটি মানুষ যখন গোটা পরিবার নিয়ে গ্রাম/দেহাত ফিরছিলেন রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসকে দুচ্ছাই করে সে সময় ভারতের প্রথম দুই ধনী কর্পোরেট গৌতম আদানি আর মুকেশ আম্বানির প্রতি মিনিটে সম্পদের পরিমাব বেড়েছে হু হু করে।

এটা যদি ক্রোনি ক্যাপিটালিজম, 'স্বজনপোষণের পুঁজিবাদ'-এর কুৎসিততম উদাহরণ না হয়, তাহলে আমাদের নতুন করে এর সংজ্ঞা তৈরি করতে হবে।

লকডাউনে আকাশ ছুঁল আদানি-আম্বানির সম্পদ

২০২০-র এপ্রিল থেকে ২০২১-এর নভেম্বরে মুকেশ আম্বানির সম্পদ ৩৬ বিলিয়ন থেকে পৌঁছেছে ৯০ বিলিয়নে (সূত্র: ব্লুমবার্গ বিলিয়নার ইনডেক্স)।

একই সময়ে গৌতম আদানির সম্পদ ৮ বিলিয়ন থেকে বেড়ে ৭০ বিলিয়নে অর্থাৎ ৮০০% বেড়েছে।(ফোর্বস ডেটা)।

একই সময়ে ভারতের ৭৫% পরিবারের আয় দ্রুত কমেছে (পিউ রিসার্চ); ১২ কোটি পরিবার অত্যধিক দারিদ্র্যে ডুবেগেছেন (আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা)।

ফলে মাথায় রাখতে হবে পুঁজিপতিদের রোজগার বাড়ার অর্থ হল দেশের মানুষের গরীবি বৃদ্ধি। আদতে এই অসাম্যের যুগ শুরু হয়েছে লিবারাল অর্থনীতির উপনিবেশিক আমলে। ডিলান সুলিভান, জেসন হিকেল ক্যাপিট্যালিজম এন্ড এক্সট্রিম পোভার্টি প্রবন্ধে পুঁজিবাদের সঙ্গে চরম দারিদ্রের যোগ বিষয়ে বৈপ্লবিক গবেষণায় দেখিয়েছেন চরম দারিদ্রের কোনও রূপই পুঁজিবাদপূর্ব

১৯ জুন, ২০০৫ সুইস ন্যাশনাল ব্যাংক (SNB) বলছে, সুইস ব্যাংকে ভারতীয় ধনকুবেরদের জমানো অর্থ ২০২৪ এ তিনগুণেরও বেশি বেড়ে হয়েছে ৩.৫৪ বিলিয়ন সুইস ফ্রাঙ্ক, ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ৩৭,৬০০ কোটি টাকা - রয়টার্স

সময়ে ছিল না, বরং পুঁজিতন্ত্রের আমলে চরম দারিদ্রের আবির্ভাব দেশে দেশে ঘটেছে এবং এই সময়ে জনকল্যানে ব্যাপক ঘাটতি দেখাগিয়েছে। আমরা দেখলাম মাত্র ৫ বছর আগে লকডাউন যুগে বহুমানুষকে চরম দারিদ্রে ডুবিয়ে দেওয়ার অবস্থা তৈরি করা হয়েছে।

ক্রোনি ক্যাপিটালিস্টরা কীভাবে কাজ করে

মাত্র কয়েকটা হাতেগোণা কর্পোরেটকে আরও বেশি বাজার দখল করিয়ে দেওয়ার পরিকল্পনায়, সরকারি উদ্যমে দেশের ওপর লকডাউন চাপিয়ে দেওয়া হয় এবং এর বিষ ফলে ছোট উদ্যোগ ধ্বংস হয়, বিপুল মানুষ আতঙ্কে শহর ছাড়েন এবং বহু মানুষ রোজগার হারান। অথচ এই সময়ে বিমানবন্দর পরিচালনায় বিন্দুমাত্র অভিজ্ঞতা না থাকা আদানি গ্রুপকে দেশজোড়া ৬টা বিমানবন্দর বন্দর পরিচালনার চুক্তি পেতে চুক্তি শর্তে তাড়াহুড়ো করে বদল আনা হয়, অন্য কর্পোরেট প্রতিযোগী যাতে দরপত্র জমা না দিতে পারে তার জন্য তাদের দপ্তরে সরকারি অর্থনৈতিক তছরূপ তদন্ত করা বাহিনী পাঠানো হয়।

এছাড়াও লকডাউনের সময় মাত্র কয়েকটা কর্পোরেট সংস্থা বেছে নিয়ে বিপুল ব্যাংক ঋণের সুবিধা পাইয়ে দেওয়া হয়। মুকেশ আম্বানির মালিকানায় রিলায়েন্স জিও ২০২০-তে ১০ বিলিয়ন বিদেশি বিনিয়োগ পেলেন। অথচ এই সময় দেশের সাধারণ ব্যবসায়ীরা ঋণ পাচ্ছিলেন না।

বিভিন্ন রিপোর্টে বিশেষ করে অর্গানাইজার আর সিএআইআই-এর রিসার্চে দেখানো হয়েছে আদানি গ্রুপের বহু কোম্পানি অফশোর ট্যাক্স হেভেন ব্যবহার করে বিপুল ট্যাক্স বাঁচিয়েছে। এবং কেন্দ্রিয় সরকার এ বিষয়ে আম্বানিদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক পদক্ষেপ নিতে স্রেফ ভুলেগেছে।

ধনীদের ওপর কেন আরও কর চাপানো উচিত

প্রথমত লকডাউনের যুগে সরকারের স্নেহধন্য কর্পোরেট গোষ্ঠীর বিপুল সম্পদ লুঠের বিরুদ্ধে ন্যায়বিচার পাওয়ার জন্য। আদানি-আম্বানির সম্পদ বৃদ্ধির ওপর মাত্র ১% কর চাপালে ৫০,০০০ কোটি রাজস্ব সংগ্রহ সম্ভব। এই অর্থে ২০২১-এর হিসেবে ৮০ কোটি নাগরিককে বিনামূল্যে রেশন দেওয়া যায়।

ভারতে ধনীতম ১০% জনগোষ্ঠীর হাতে দেশের ৭৭% সম্পদ সংহত হয়েছে। অন্যদিকে ৬০% মানুষের হাতে আছে মাত্র ৪.৭% সম্পদ (ক্রেডিট সুইস রিপোর্ট)।

তাছাড়া উপনিবেশিক আমল থেকে যে নিপুল অসাম্য তৈরি করার উদ্যম নেওয়া হয়েছে, সেই অসামান্য কমাতে আরও বেশি বেশি অর্থ সামাজিক খাতে বিনিয়োগ করা দরকার। ধনীদের ওপর ৪% “সম্পদ কর” ব ে বছরে ১৮ লক্ষ কোটি টাকা সংগ্রহ হতে পারে - যে অঙ্ক সরকারি স্কুল-হাসপাতালের বাজেটের ৩ গুণ।

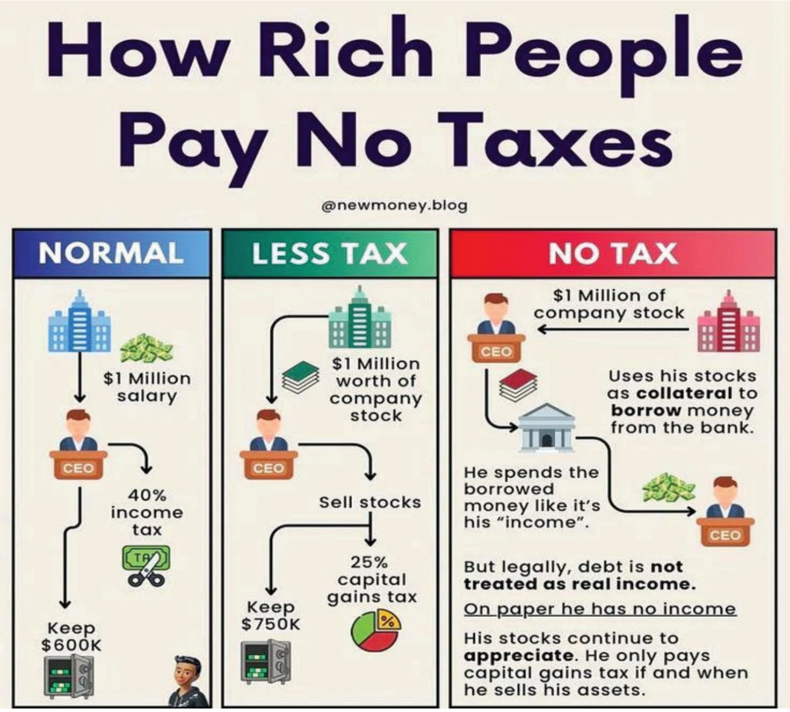

ধনীদের ওপর আরও বেশি কর চাপানো দরকার। আমাদের দাবি ৫ কোটি টাকার ওপরে সম্পদ আছে এমন মানুষের ওপর ৪% বার্ষিক কর, এবং অতিরিক্ত মুনাফা কর চাওয়ানো দরকার (যেমন লকডাউনে যাদের আয় ৩০০% বেড়েছে তাদের ৭.৫% কর চাপুক)।

গণসম্পদ লুঠ রোধ করে সাধাণ গণজনের রোজগার বাড়াতে, সঞ্চয় বাড়াতে দেখা দরকার আদানি-আম্বানির মতো ক্রোনী গোষ্ঠীগুলি যেন সরকারি ব্যাংক ঋণ, প্রাকৃতিক সম্পদ (কয়লা, বিমানবন্দর) এবং নীতিনির্ধারণে একচেটিয়া আধিপত্য না করতে পারে।

২০২১-এর 'হুরুন ইন্ডিয়া'-র ধনী ব্যক্তিদের তালিকায় ১০০৭ পরিবার উঠে এসেছে; প্রত্যেকে ১,০০০+ কোটি টাকার সম্পদের মালিক। ১০০৭ পরিবারে মাত্র ২% সম্পদ কর আরোপ করলে ২০২১-এর হিসেবে ১.৮৪ লক্ষ কোটি টাকা আদায় হওয়া সম্ভব। হুরুন গ্লোবাল বিলিয়নেয়ার তালিকা অনুসারে, ২০২৩-এ ভারতে মার্কিন ডলারের হিসেবে ১৮৭ জন বিলিয়নেয়ার বেড়েছে, আগের বছরের তুলনায় ১৬ জন বেশি। তাদের মোট আনুমানিক সম্পদও বেড়েছে অনেকটাই। এই প্রবণতা বিশ্বব্যাপী সম্পদ সংহত হওয়ার প্যাটার্ন থেকে সম্পূর্ণ আদালা - ২০২৩-এ বিশ্বজুড়ে ডলার এককে বিলিয়নেয়ারের সংখ্যা ৮ শতাংশ কমেছে, তাদের সম্পদও কমেছে ১০ শতাংশ হারে।

অথচ গত পাঁচ বছরে বিশ্বব্যাপী বিলিয়নেয়ার তালিকায় ভারতীয়দের অংশিদারি দ্বিগুণ হয়েছে, ৪.৮ শতাংশ থেকে বেড়ে হয়েছে ৮ শতাংশ। একে সামগ্রিক আয় বৃদ্ধির ফল হিসেবে দেখলে ভুল হবে; আদতে এই প্রবণতা ভারত রাষ্ট্রের সম্পদ বৈষম্য বৃদ্ধি করার প্রচেষ্টার আয়না। অক্সফামের সমীক্ষা বলছে কোভিড-১৯ মহামারীর আগের দশকে কোটিপতিদের সম্পদ দশগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে; এবং এই সূত্রে জানাগেছে ২০১৯-এ জনসংখ্যার শীর্ষ দখল নিয়েছে ১০ শতাংশ জাতীয় সম্পদের ৭৭ শতাংশ; শীর্ষ ১ শতাংশ ২০১৭-এ উৎপাদিত বর্ধিত সম্পদের প্রায় তিন-চতুর্থাংশ দখল করেছে। মহামারী এবং তার পরিণতি, সম্পদের বৈষম্যের পরিস্থিতিকে আরও খারাপ করেছে। ২০১২ থেকে ২০২১-এর দশকে, জনসংখ্যার শীর্ষ ১০ শতাংশ ভারতে বিপুল জনসংখ্যার তৈরি করা সম্পদের ৪০ শতাংশ আত্মসাৎ করেছে। ২০২৩-এর প্রথম দিকে, ভারতের সবচেয়ে ধনী ২১ জনের কাছে ৭০ কোটি ভারতীয়ের চেয়ে বেশি সম্পদ গচ্ছিত ছিল।

অর্থনৈতিক বৈষম্য কমানোর উদ্দেশ্যে সরকারের হাতে থাকা অন্যতম বড় হাতিয়ার কর আরোপের নীতি। ঐতিহাসিকভাবে আমরা জানি, ধনীদের ওপর আরও বেশি কর আরোপ করা, আরও বেশি সমানাধিকার সম্পন্ন সমাজ তৈরি করতে এবং ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে চরম ব্যবধান রোধ করে। করোনা মহামারীর আগের দশকগুলো থেকেই প্রগতিশীল কর ব্যবস্থা ভেঙে পড়ে। কয়েক লক্ষ ব্যক্তি ধনী এবং হাতে গোণা কয়েক শত কর্পোরেট কোম্পানিকে কর ছাড় আর কম কর দেওয়ার সুযোগ করে দিলেও কোটি কোটি সাধারণ নাগরিকের ওপর কর বাড়ানো হয়। ১৯৮০-র দশকের গোড়ার দিকে মূলত ধনীদের ওপর চাপানো সব কটা করের হার ক্রমশ কমছে বলেই, রাষ্ট্র পরিচালক কর্তাব্যক্তিরা জানেন সেই ছাড়ের সুবাদে ১% ধনীর সিন্দুকে মোট জাতীয় সম্পদের সব থেকে বড় অংশ সঞ্চিত হয়েছে। কয়েক দশক ধরে, অতি ধনী, বড় কর্পোরেশনগুলোকে দেওয়া এই ধরনের বিপুল কর ছাড়ের পিছনে নব্য উদারবাদীদের যুক্তি ছিল, যে চুঁইয়ে পড়া অর্থনৈতিক তত্ত্ব অনুযায়ী এই বিপুল সম্পদের অনেকটাই উদ্বৃত্ত তৈরি করবে এবং এই উদ্বৃত্ত সম্পদে সমাজ উপকৃত হবে। রাজনীতিবিদ, ব্যবসায়ীরা জনগণকে আশ্বস্ত করে বলেছিলেন, এই বিপুল উদ্বৃত্ত নিয়ে ধনী আর কর্পোরেটেরা কর্মসংস্থান তৈরি করে জনগণকে কাজ পেতে সহায়তা করবে এবং আরও বড় বিনিয়োগ ও উদ্ভাবনার দ্বার খুলে দেবে। এর ফলে সামগ্রিকভাবে সব ধরণের জনগণের স্বার্থ পূরণ হবে।

কিন্তু আজকের বৈষম্যের বিস্ফোরণ চোখে আঙুল দিয়ে দেখায় যে এই তত্ত্ব, ক্ষমতাসীনেরা আদতে ধনীদের স্বার্থপূরণে ব্যবহার করেছে ব্যাপকভাবে। কর্মসংস্থান এবং বিনিয়োগ তৈরিতে কম করের সুবিধা ব্যবহার না করে ধনী, অতি ধনী, কর্পোরেটেরা নিজেদের জন্য আরও বেশি সম্পদ সঞ্চয় করেছে। আজ যে ধনী এবং বৃহৎ কর্পোরেশনগুলির ঘাড়ে কম কর চাপানোর প্রচার সর্বব্যাপী, সেটা কিন্তু চিরকালের পুঁজিবাদী এজেন্ডার শীর্ষে ছিল না। গত শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে, ধনীদের ওপর অনেক বেশি কর চাপানো হয়েছে এবং সেটাই ছিল বেশ কয়েক দশকের মার্কিন রাষ্ট্রীয় নীতি। উদাহরণস্বরূপ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, ১৯৫১ থেকে ১৯৬৩ পর্যন্ত ফেডারেল আয়করের সর্বোচ্চ প্রান্তিক হার ছিল ৯১%, ১৯৭৫ পর্যন্ত উত্তরাধিকার করের সর্বোচ্চ হার ছিল ৭৭% এবং ১৯৫০ এবং ১৯৬০ এর দশকে কর্পোরেট করের গড় হার ছিল ৫০% এর কিছু বেশি। এমনকি ১৯৮০-তে ধনীদের ওপর শীর্ষ প্রান্তিক আয়কর হার ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে (ফেডারেল স্তরে) ৭০% এবং যুক্তরাজ্যে ৬০%। এই উচ্চ করের হার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপের অর্থনৈতিক উন্নয়নের সবচেয়ে সফল কয়েক দশকের সাথে সমান্তরাল ভাবে পাঠ করা চলে, সে সময়ে নাগরিকদের জন্য শিক্ষা এবং স্বাস্থ্যসেবার মতো মৌলিক অধিকার অর্জনের অর্থায়নে এই কর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল, একই সাথে বৈষম্যও নিয়ন্ত্রণে রেখেছিল। রিসার্চ স্কুল অফ ইন্টারন্যাশনাল ট্যাক্সেশনের (RSIT) ১৪২ দেশ নিয়ে সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা গেছে যে কর্পোরেশনগুলোর ওপর থেকে প্রতি ১% কর কমানোর জন্য, সরকারগুলি ভোগ্য কর ০.৩৫% বৃদ্ধি করেছে। ভারত সম্প্রতি কর্পোরেটের ওপর কর কমিয়েছে অনেকটাই, একই সাথে সরকারি আয়ের স্তর বজায় রাখতে পণ্য ও পরিষেবার ওপর কেন্দ্রীভূত কর ব্যবস্থা (GST) চালু করেছে যার ফলে সাধারণ পরিবারগুলোকে অনেকটাই বেশি পরোক্ষ কর দিতে হচ্ছে। এলন মাস্ক বিপুল ধনী হওয়া সত্ত্বেও, আমেরিকিয় মিডিয়া প্রোপাবলিকার হিসাব অনুযায়ী ২০১৪-১৮ সময়কালে সে খুব বেশি হলে সরকারকে ৩.২৭% রাজস্ব জমা করেছে। কারন মাস্ক তার সম্পদ বাঁচাতে বেশিরভাগ

সম্পদ কোম্পানির স্টকে জমা রেখেছে বলেই তাকে এত কম কর দিতে হয়েছে। স্টকের মূল্য বৃদ্ধিকে আমেরিকায় 'unrealized capital income' হিসেবে গণ্য করা হয় এবং স্টক বিক্রি না হলে সেই দাম্বাড়া স্টকে কর প্রযোজ্য হয় না। অথচ স্টক ঋণ নেওয়ার জন্য জামানত হিসেবে ব্যবহার করা হয়। এই পথ মাস্ক ৪৪ বিলিয়ন ডলার মূল্যের চুক্তিতে সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম টুইটার কেনার পরিকল্পনায় ব্যবহার করেছিলেন।

সুতরাং, এটা সম্পূর্ণ ফাটকা পুঁজির যুগ। আপনার সম্পত্তির মূল্য বাড়তে পারে, এবং সেই অতিরিক্ত মূল্য সম্পূর্ণ আপনার, যতক্ষণ না আপনি সেটি বিক্রি করছেন ততক্ষণ পর্যন্ত সেটি করমুক্ত। উদাহরণস্বরূপ, যদি অ্যামাজনের শেয়ারের দাম দ্বিগুণ হয়, তাহলে জেফ বেজোস কোটি কোটি ডলার আয় করেন। কিন্তু যেহেতু এই উপার্জনকে আইনি অর্থে আয় হিসেবে দেখা হয় না, তাই যতক্ষণ না জেফ বেজোস কোনও শেয়ার বিক্রি করবেন ততক্ষণ পর্যন্ত তাকে কোনও কর দিতে হবে না।

ব্যাপক জনসমর্থন পাওয়ার পরও, ধনীদের ওপর কর আরোপের মতো একটি সাধারণ অর্থনৈতিক-প্রশাসনিক নীতি কেন রাজনৈতিক এজেন্ডার শীর্ষে চলে আসে না? সব অতি-ধনী ব্যক্তিই বেশি কর আরোপের পক্ষে নন, এবং তাদের নিজস্ব স্বার্থ রক্ষার বলয় রয়েছে। তারা কখনও সরাসরি রাজনৈতিক নেতাদের ওপর চাপ সৃষ্টি করে, কখনও রাজনৈতিক অনুদান আর তদবির করে, অধিকাংশ সময়ে গণমাধ্যম নিয়ন্ত্রণ এবং মালিকানা তৈরি করে কর আরোপের মাত্রা কমিয়েছে। ফ্রান্সে, ১১ জন বিলিয়নেয়ার সংবাদ সংস্থার মালিক, দৈনিক বিক্রি হওয়া সংবাদপত্রের ৮০% এরও বেশি, টেলিভিশন বাজারের ৫৭% এবং রেডিও বাজারের ৪৭% শেয়ারের প্রতিনিধিত্ব করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, মুষ্টিমেয় বিলিয়নেয়ার - যাদের মধ্যে জেফ বেজোস, মাইকেল ব্লুমবার্গ এবং রুপার্ট মারডোক - জাতীয় সংবাদ শিল্পের একটি বৃহৎ অংশের ওপর উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণ রাখেন। মেক্সিকোর গণমাধ্যমের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ তাদের দেশের সবচেয়ে ধনী ব্যক্তি কার্লোস স্লিমের মালিকানাধীন।

কেনিয়ার প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ড্যানিয়েল আরাপ মোই, যাকে দেশের সবচেয়ে ধনী ব্যক্তিদের একজন হিসেবে বিবেচনা করা হয়, ২০২২ ে মারা যাওয়ার আগে স্ট্যান্ডার্ড সহ বেশ কয়েকটি সংবাদপত্রের মালিক ছিলেন। ভারতে, ৮০০ মিলিয়নেরও বেশি মানুষের কাছে পৌঁছানো ৭২টি টিভি চ্যানেল একজন বিলিয়নেয়ারের মালিকানাধীন: যার নাম মুকেশ আম্বানি। কয়েকজন অতি-ধনী ব্যক্তির হাতে মিডিয়ার মালিকানা রাজনৈতিক বিতর্কের শর্তাবলীকে প্রভাবিত করার জন্য তাদের যে ক্ষমতা দেয়, তা প্রগতিশীল সংস্কারের জন্য চ্যালেঞ্জ তৈরি করেছে। উদাহরণস্বরূপ, ফরাসি অর্থনীতিবিদ জুলিয়া ক্যাগে সম্প্রতি নথিভুক্ত করেছেন যে কীভাবে ফরাসি ধনকুবের এবং পণ্ডিত ভিনসেন্ট বোলোরের মালিকানাধীন মিডিয়া আউটলেটগুলি বোলোরের দ্বারা পরিচালিত ডানপন্থী নীতি, কর নীতির, সমর্থনকারী অতিথিদের বর্ধিত সম্প্রচার সময় দিয়েছে।

হকার-কারিগর-চাষী জীট এহেন কর্পোরেট ঔপনিবেশিকতার ধ্বংস কামনা করে। ভারতে অতি ধনীদের ওপর সম্পদ কর বসানোর জন্য নিরন্তর আন্দোলন করে চলেছে গণআন্দোলনের প্রবাদপ্রতিম কণ্ঠস্বর শক্তিমান ঘোষের নেতৃত্বাধীন ন্যাশনাল হকার ফেডারেশান। তাদের সহযোগী সংগঠন হিসাবে আমাদের এই প্রকাশনা বাঙলার হকার চাষি কারিগরের দাবি বিশ্বের মঞ্চে প্রতিধ্বনি তুলুক এই কামনা করি। লকডাউনে আদানি-আম্বানির সম্পদ বৃদ্ধি প্রমাণ করে কিভাবে ক্রোনি ক্যাপিটালিজম সাধারণ মানুষের দুর্ভোগে মুনাফা করে। এখন সময় এসেছে এই অবৈধ সমৃদ্ধির ওপর কর বসিয়ে ।দেশের গরিবদের জন্য তা কাজে লাগানোর।

মানুষ হিসেবে বেঁচে থাকার অধিকারের লড়াই

ম্যাকেঞ্জি ডাব্রে

মহারাষ্ট্র হকার্স ফেডারেশন ন্যাশনাল হকার্স ফেডারেশনের সাথে যুক্ত। এই সংগঠন হকারদের নানান সমস্যা সমাধানের জন্য কাজ করছে। আমাদের দাবি হকার আইন ২০১৪ বাস্তবায়ন করা। মহারাষ্ট্র হকার্স ফেডারেশন হকারদের মর্যাদার সাথে বাঁচতে এবং হকারদের জীবনযাত্রার মান উন্নত করতে বদ্ধ পরিকর।মহারাষ্ট্রের ৩১টি জেলা এবং ৪৯টি শহরে মহারাষ্ট্র হকার্স ফেডারেশনের যোগ রয়েছে। রাজ্যের বিভিন্ন হকার সংগঠনকে ফেডারেশনের সাথে নেটওয়ার্কিংও আছে। আমাদের প্রাথমিক লক্ষ্য হকার সংগঠনগুলির হকার আইন বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করা; তাদের অধিকার এবং আইন সম্পর্কে সচেতনতামূলক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা এবং শহর থেকে রাজ্য স্তরে হকারদের অধিকারের জন্য লড়াই করা; নিম্ন আদালত থেকে উচ্চ আদালত পর্যন্ত হকারদের অধিকারের জন্য লড়াই করা। এইভাবেই মহারাষ্ট্র হকার্স ফেডারেশন সারা প্রদেশে কাজ করে চলেছে।

মহারাষ্ট্র হকার্স ফেডারেশনের কাজ এবং রাজ্যে হকারদের সমস্যাগুলির ওপর দাবি:-

১. জাতীয় হকার ফেডারেশনের সাথে যুক্ত হয়ে জাতীয় হকার ফেডারেশনের নির্দেশনা এবং নেতৃত্বে মহারাষ্ট্র রাজ্যে কাজ করা।

২. সরকারের ওপর চাপ প্রয়োগের কৌশল ব্যবহার করে পথ বিক্রেতা (জীবিকা সুরক্ষা এবং রাস্তার বিক্রেতাদের ক্ষতিপূরণ) আইন, ২০১৪ বাস্তবায়ন করানো।

৩. সাধারণ হকারদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অগ্রগতির জন্য একটি প্রচারণা উদ্যম শুরু করার পরিকল্পনা। প্রধানত, এই সংগঠন সরাসরি মুদ্রাস্ফীতি, জিএসটি, বেকারত্ব, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্পোরেট ডাকাতি সম্পর্কিত বিষয়গুলি নিয়ে সক্রিয় সচেতনতা তৈরি করবে এবং কাজের পরিধি আরও বিস্তৃত করবে।

৪. ধর্মের নামে, জাতের নামে সাম্প্রদায়িক, সামাজিক বিভাজন তৈরি করা হচ্ছে পরিকল্পনা করেই। হকারদের তাদের ধর্মের কারণে হয়রানি করা হচ্ছে। তাই ধর্মীয় মিলনের জন্য কমিটি এবং সমাজের মধ্যে বিভিন্ন সচেতনতামূলক কর্মসূচি আয়োজন করা দরকার। প্রশাসনকে এই বিষয়ে সতর্ক এবং ক্ষমতায়িত করা দরকার।

৫. সরকারি কর্মকর্তাদের দায়িত্ব নির্ধারণে সচেষ্ট হোন এবং তাদেরকে হকার আইন বাস্তবায়ন এবং হকারদের সুরক্ষার জন্য কাজ করতে বাধ্য করুন।

৬. নগরের হকার কমিটিকে প্রশিক্ষণ দিন যাতে তারা আইন বাস্তবায়নের জন্য সঠিকভাবে কাজ করতে পারে।

৭. সংবিধান বিরোধী কার্যকলাপ পরিকল্পিতভাবে চালানো হচ্ছে। এর বিরোধিতা করুন এবং সংবিধান সুরক্ষা ও বাস্তবায়নের জন্য কর্মসূচি বাস্তবায়ন করুন।

৮. বৃহৎ ভবন কমপ্লেক্সে হকারদের জন্য সংরক্ষণ এবং সংরক্ষিত স্থান নিশ্চিত করার জন্য একটি প্রচারণা বাস্তবায়ন করুন।

৯. ২০১৪-র হকার আইন অনুসারে, রাজ্যের সমস্ত রাস্তার বিক্রেতাদের কমপক্ষে প্রতি ৫ বছর অন্তর জরিপ করা বাধ্যতামূলক। রাজ্যের সমস্ত মহানগর পৌরসভা, পৌরসভা এবং কাউন্সিলগুলিতে নতুন করে জরিপ উদ্যম পরিচালনা করা উচিত। এছাড়াও, ২০১৪-র পথ বিক্রেতা আইনের ৫ ধারা অনুসারে, রাস্তার বিক্রেতাদের কাছ থেকে একটি স্ব-ঘোষণা নেওয়া উচিত এবং তাদের সকলকে একটি শংসাপত্র জারি করা উচিত। এই কাজটি এক

মাসের মধ্যে শুরু করা আবশ্যিক।

১০. ২০০৯-তে জাতীয় পথ বিক্রেতা নীতিমালার ভিত্তিতে রাস্তার বিক্রেতা আইন ২০১৪ অনুসারে একটি শহর বিক্রেতা কমিটি (টাউন ভেন্ডিং কমিটি) প্রতিষ্ঠা করার দায় মহানগর পৌরসভা, পৌরনিগম এবং নগর পরিষদে। যদি ৫ বছর অতিবাহিত হয়, তাহলে তাদের ২০১৬-র সরকারি নিয়ম অনুসারে নতুন করে নির্বাচিত করা উচিত এবং একটি টাউন ভেন্ডিং কমিটি তৈরি করা আবশ্যিকভাবে দরকার।

১১. মহারাষ্ট্রের সমস্ত মহানগর পৌরসভা, পৌরসভা এবং নগর পরিষদে, দখল দমন বিভাগের প্রধানরা পুলিশের সহায়তায় পথ বিক্রেতাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিচ্ছেন। বলুন, এটা সরাসরি বেআইনি কাজ। পথ বিক্রেতা আইন ২০১৪ ধারা ৩ (৩) লঙ্ঘন করা উচিত নয়। এই পদক্ষেপ অবিলম্বে বন্ধ করা উচিত এবং হকার আইন কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন করা উচিত।

১২. পথ বিক্রেতা (রাস্তা বিক্রেতাদের জীবিকা রক্ষা ও প্রতিকার) আইন ২০১৪ এর ধারা ৩৮ অনুসারে, সরকারকে হকার আইন বাস্তবায়নের জন্য একটি পরিকল্পনা তৈরি করতে হবে। এই প্রকল্পের অভাবে লক্ষ লক্ষ পথ বিক্রেতা তাদের জীবিকা নির্বাহের অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে, তাই আগামী এক মাসের মধ্যে, হকার আইন ২০১৪ অনুসারে একটি পরিকল্পনা তৈরি করে বাস্তবায়ন করা উচিত।

১৩. রাজ্যে বর্তমানে যেসব স্থানে জরিপ চলছে, সেখানে প্রমাণ হিসেবে একটি আবাসিক শংসাপত্র (আবাসিক ঠিকানা) চাওয়া হচ্ছে। বোম্বে হাইকোর্টের চূড়ান্ত রায় থাকা সত্ত্বেও এই শর্তটি দেখানো হচ্ছে। এই বিষয়ে একটি সার্কুলার জারি করা উচিত এবং সমস্ত মহানগর পৌরসভা এবং পৌরসভাগুলিকে অবহিত করা উচিত।

১৪. প্রধানমন্ত্রী স্বানিধি যোজনার আওতায় সকল হকারদের ঋণ প্রদানের পরিকল্পনা রয়েছে। কিন্তু মুম্বাই সহ অনেক পৌর কর্পোরেশনে আবেদন করার পরেও LOR না পাওয়ার কারণে এই প্রকল্পের সুবিধা পাওয়া যায়নি। তবে, LOR প্রদান করে এই ধরণের সকল হকারদের উৎসাহিত করা উচিত।

১৫. হকার আইন অনুসারে রাজ্যের সকল পৌর কর্পোরেশন এবং পৌরসভায় অবিলম্বে অভিযোগ প্রতিকার কমিটি গঠন করা উচিত।

১৬. আমাদের রাজ্য, মহারাষ্ট্রে হকার আইন বাস্তবায়নের সময়, সমস্ত ধরণের হকার জরিপ না করা এবং তাদের সার্টিফিকেট, আসন, পরিচয়পত্র, টাউন ভেন্ডিং কমিটি এবং বিভিন্ন প্রকল্পের সুবিধা ইত্যাদি প্রদান না করা পর্যন্ত কোনও পদক্ষেপ নেওয়া উচিত নয়।

১৭. মুম্বাই পৌর কর্পোরেশন কর্তৃক মুম্বাইয়ের ৯৯,৪৩৫ জন হকারের একটি জরিপ পরিচালিত হয়েছিল। এখন, নির্বাচন পরিচালনা করার সময়, মাত্র ১৭,৫০০ হকারকে তালিকাভুক্ত করা হয়েছিল। এটি অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। আমরা এই পদক্ষেপের নিন্দা জানাই। সরকারের উচিত অবিলম্বে হস্তক্ষেপ করে উক্ত টিভিসি নির্বাচন বন্ধ করা এবং ৯৯,০০০ হকারকে অন্তর্ভুক্ত করে নির্বাচনের নতুন তারিখ ঘোষণা করা।

১৮. হকার নীতি অনুসারে, শহরের ২.৫% জমি হকারদের জন্য সংরক্ষিত রাখা উচিত। "শহর উন্নয়ন পরিকল্পনা"-এ এই ধরণের বিধান রাখা উচিত।

১৯. হকার আইন বাস্তবায়নের জন্য একটি "রাজ্য পর্যায়ের কমিটি" গঠন করা উচিত এবং এতে সংগঠনের প্রতিনিধিদের অন্তর্ভুক্ত করা উচিত।

২০. এনইউএলএম (পৌর পরিষদ প্রশাসন অধিদপ্তর) বাজেটের ৫% হকারদের উন্নয়নের জন্য। সেই কর্মসূচি হকারদের প্রতিনিধিদের কাছে উপস্থাপন করা উচিত এবং তাদের পরামর্শকে সম্মান করা উচিত।

জাতীয় হকার ফেডারেশনের নেতৃত্বে, মহারাষ্ট্র হকার ফেডারেশন ওপরোক্ত দাবিগুলি নিয়ে কাজ করছে। সংগঠনে নতুন নেতৃত্ব তৈরির জন্য কর্মসূচি প্রচারণা এবং প্রশিক্ষণের ওপর জোর দেওয়া হচ্ছে।

---

১৯ সেপ্টেম্বর অসাম্য, জলবায়ু বিপর্যয়ের বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী আন্দোলনের সংহতিতে ন্যাশনাল হকার্স ফেডারেশন, অল ইন্ডিয়া ওমেন হকার ফেডারেশনের জমায়েত

রাঁচির হকার, দোকানদারদের আন্দোলন ঐতিহাসিক অধিকার ছিনিয়ে এনেছে

দীপক কুমার

আমি ছোট থেকেই ফুটপাথ দোকানদারদের কাছাকাছি ছিলাম। তখন থেকেই তাদের পরিস্থিতি, তাদের কষ্ট, তাদের অসুবিধে, তাদের সমস্যা অনেক কাছ থেকেই প্রত্যক্ষ্য করেছি। তাদের ওপরে যখন পুলিশ প্রশাসন অত্যাচার করত, তখন আমি নিজের চোখে দেখেছিলাম তাদের কষ্ট, যন্ত্রণা। সেই কষ্ট যন্ত্রণা লাঘব করার জন্য আমি তাদের পাশে দাঁড়াবার সিদ্ধান্ত নিলাম। আমি দেখলাম, একমাত্র একটা সঙ্গঠন হকারদের জন্য কাজ করে। সেই সঙ্গঠনের কাজকর্মের একটা দীর্ঘ ঐতিহ্য ছিল। তাদের লড়াই, সমস্যা সমাধানে তাদের অসামান্য ভূমিকা বুঝলাম। সেই পরম্পরার সাথী হয়ে আমি ফুটপাত দোকানদারদের পাশে দাঁড়াতে এবং তাদের সংঘর্ষের সাথী হতে পারলাম। আমি সবসময় চেষ্টা করছিলাম তাদের মুখে যেন হাসি ফোটাতে পারি, তাদের সমস্যার সমাধান করতে পারি। এই প্রতিশ্রুতি রক্ষায় আমি ন্যাশনাল হকার্স ফেডারেশনের সক্রিয় সদস্য হিসেবে যোগ দিই। রাঁচির দোকানদারদের পাশে আমি ন্যাশনাল হকার্স ফেডারেশনের শক্তি নিয়ে আমি দাঁড়িয়েছি এবং ভবিষতেও তাদের পাশে থাকব এই প্রতিশ্রুতি আমি দিতে পারি।

আমি ২০০৫ থেকে রাচীর ফুটপাথের হকারদের সাথে আছি। কিন্তু আমার আসল লড়াই শুরু হয় ২০০৯ থেকে। যখনই তাদের ওপর কোনওরকম অত্যাচার চলত আমি যেতাম তাদের কাঁধে হাত রেখে তাদের সাথে দাঁড়িয়ে তাদের লড়াইতে সক্রিয়ভাবে যোগ দিয়েছি। ন্যাশনাল হকার্স ফেডারেশনের তৈরি আন্দোলনের গাইডলাইন অনুযায়ী লড়াই করার চেষ্টা করেছি।

২০১৪-র আইন প্রণয়নে ভূমিকা

এই বছর ভারত সরকার, পার্লামেন্টে ঐতিহাসিক হকার আইন প্রতিপালন করে। এই আইন আমাদের গর্ব, আমাদের আন্দোলনের হাতিয়ার। সেই আইন তৈরীতে আমাদের রাঁচি, ঝাড়খণ্ডের হকার সমাজের জবরদস্ত ভূমিকা ছিল। এর জন্য আমরা পুরো রাচীর বাজার প্রতিনিধিদের সাথে, কখনোও কখনোও রাচীর ফুটপাত বাজারের দোকানদারদের সাথে প্রচুর বৈঠক করেছি, তাদের নিয়ে পথসভা করেছি, তাদের নিয়ে মিছিল করেছি। এমনকি দিল্লীর যন্তরমন্তরেও আমরা বিপুল সংখ্যায় গিয়ে ধর্না প্রদর্শন করেছি, রালি করেছি।

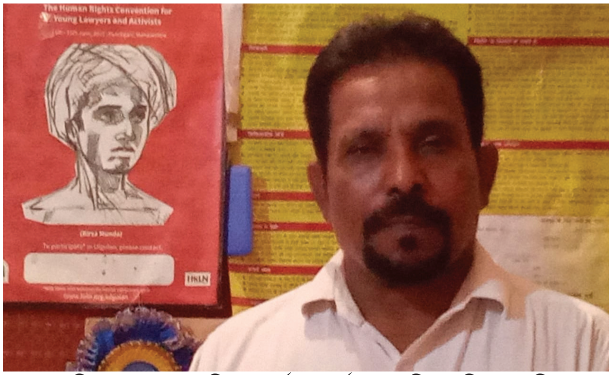

রামলীলা ময়দানে বিশাল জমায়েত করেছি। এই প্রদর্শন সমাবেশে হকারের আওয়াজ তোলে এই আইন শুধু দিল্লীর জন্য প্রয়োজন, এমন নয়, এই আইন প্রয়োজন ভারতের প্রতিটি অঞ্চলে যত হকার আছে, তাদের জন্যও। আমি আমৃত্যু গর্ব করব, যে এই আইন তৈরীতে আমাদের নেতৃত্ব আর ঝাড়খণ্ডের হকারদের খুব বড় ভূমিকা আছে।

এই আইন আসার ফলে কি সুবিধা হয়েছে

এই আইন আসার পর সবচেয়ে বড় সুবিধা হয়েছে যে এর আগে প্রশাসন হকারদের দখলদার নামে অপমান করত। সেই অপমান এখন আর আমাদের কেউ করতে পারবে না। হকার আইন আসার ফলে আমাদের ফুটপাত দোকানদাররা বেআইনি ব্যবসা করে - এমন বেআইনি কথা বলার মত সুযোগ রইল না। আইন আমাদের রোজগারের অধিকার দিয়েছে, জায়গা দিয়েছে, অধিকার দিয়েছে। হকারি করা এখন জনগণের মৌলিক অধিকার। এই আইনের ধাক্কায় হকারদের বিপুল সুবিধা হয়েছে। সরকারকে হকারদের জন্য উপযুক্ত পরিকল্পনা তৈরি করতে হচ্ছে। হকারদের জীবন জীবিকা সমাধানের জন্য সরকার আমাদের সঙ্গে বৈঠকে বসতে বাধ্য হচ্ছে। সরকারের তরফ থেকে বেশ কিছু সুবিধেও দেওয়া হচ্ছে। হরকার এখন হকারদের ব্যাঙ্ক লোনে ব্যবস্থা করছে। এছাড়াও আরও বেশ কিছু সুযোগ সুবিধে পাওয়া যাচ্ছে।

কিন্তু এ সবই সম্ভব হচ্ছে ন্যাশনাল হকার ফেডারেশনের উপযুক্ত নেতৃত্বের সহযোগিতায় হকারেরা আজ নতুন রাস্তায়,

নতুনভাবে চলতে পারছে। আমাদের সব থেকে বড় গর্ব হল আইন অনুযায়ী শহরে হকারদের সমস্যার সমাধানের জন্য টাউন ভেন্ডিং কমিটি তৈরি করা দরকার। এই কাজ করবে হয় শহরের মিউনিসিপ্যালিটি, না হয় সিটি কর্পোরেশন। আমাদের আন্দোলনের পরিনাম স্বরূপ ভারতবর্ষের মধ্যে সবার প্রথমে টাউন ভেন্ডিং কমিটি আমাদের রাঁচিতে তৈরী হয়। প্রথম টাউন ভেন্ডিং কমিটি তৈরি হবার গর্ব তৈরি হয়েছে রাঁচির। এই কমিটির বেশ কিছু ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

হকার সমীক্ষা, হকার সার্ভে

আমি আগেইবলেছি, ঐতিহাসিক প্রথম টাউন ভেন্ডিং কমিটি তৈড়ি হয় রাঁচিতেই আমাদের হকারদের প্রবল আন্দোলনের ফলে। আমরা গড়ে তুলেছি অটল স্মৃতি ভেন্ডার্স মার্কেট। রাঁচিতে আইন অনুযায়ী ভেন্ডার্স বা হকার সমীক্ষা হয়েছে ২০১৬-য়। এই সমীক্ষায় ৫০৯১ জন হকার চিহ্নিত করা হয়েছে। এই অঙ্কটা সরকারও মেনে নিয়েছে।

একই সঙ্গে আমরা আন্দোলনও চালিয়ে যাচ্ছি যাতে রাঁচির হকাররা সহজ শর্তে ব্যাঙ্ক লোনের সুবিধে পায়। তাদের জীবিকা বাঁচিয়ে রাখার জন্য এটা একটি বড় পদক্ষেপ হবে। অতীতে ব্যাঙ্ক আমাদের তুচ্ছতাচ্ছিল্য করত। আজ ব্যাঙ্ক আমাদের যথেষ্ট সম্মান করে। এবং হকারদের লোন দিতে ব্যাঙ্ক মোটামুটি রাজিও হয়েছে। এটাই আমাদের আন্দোলনের সাফল্য।

সি এইচ এম-এর প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপন

বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে ২৬ আগষ্ট ২০২৫ হকার আন্দোলনের অন্যতম সংগঠন ক্যালকাটা হকার্স মেন্স ইউনিয়নের ৫৯ তম প্রতিষ্ঠা দিবস পালিত হলো ঐতিহাসিক ভারতসভা হলে। ইউনিয়নের প্রতিষ্ঠা দিবস পালনের সাথে সাথে একদিনে ইউনিয়নের প্রতিষ্ঠাতা শক্তিমান ঘোষের জন্মদিন হওয়ায় তার ৭৫ টম জন্মদিনও পালন করা হয়। এ উপলক্ষ্যে ভারতসভা হলে অনুষ্ঠিত সভায় বক্তব্য রাখেন সি এইচ এমের ভারপ্রাপ্ত সাধারন সম্পাদক সুনিল সিং; যুগ্ম সম্পাদক মহেন্দ্র শর্মা; টাউন ভেন্ডিং কমিটির সদস্য অশোক চক্রবর্তী ; সারা ভারত মহিলা হকার ফেডারেশনের সাধারন সম্পাদিকা অনিতা দাস ;হকার অধিকার রক্ষা কমিটির সভাপতি দেবাশিস দাস; রাজারহাট নিউটাউন হকার সংগ্রাম কমিটির নেতা রমণী হালদার ; সত্যনারায়ন পার্ক হকার এসোশিয়শনের রকি; পাটুলি ভাসমান বাজার হকার এসোশিয়শনের রেখা মারিক ; হকার আন্দোলনের নেতা সুরেন্দ্র সিং ;যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র অত্রি; শক্তিমান ঘোষের সহযাত্রী বন্ধু ইউসিপিআই-এর সম্পাদক উজ্জ্বল সেনগুপ্ত এবং শক্তিমান ঘোষ। সঞ্চালনায় ছিলেন মুরাদ হোসেন। ভীড়ে উপচে পরা সভায় হকার সংগ্রাম কমিটির মুখপত্র এই সময় মানব জমিন প্রকাশের উদ্বোধন করা হয়। প্রতিমাসে পত্রিকাটি প্রকাশিত হবে।

মুরাদ হোসেন

হকার আন্দোলন, শক্তিমান এবং বন্ধুরা : ইমানুল হক

অল্প অল্প শীত। সন্ধ্যাবেলা কৃষ্ণনগর সরকারি কলেজ থেকে পড়িয়ে 'আজকাল' দপ্তরে গিয়েছি। :আজকাল'-এর প্রাণপুরুষ সাংবাদিকতার চাকরি ছেড়ে কলেজে পড়াতে যাবো জেনে বলেছিলেন, তুমি 'আজকাল' ছাড়ছো, 'আজকাল' তোমাকে ছাড়ছে না। আমার খুব শ্রদ্ধেয় এই মানুষের কথায়, আমি পরে চার বছরের বেশি সময় বিনা পারিশ্রমিকে 'আজকাল' গিয়ে সাধ্যমতো কাজ করেছি। ২৬ নভেম্বর ১৯৯৬ রাত। গৌতমদা বললেন, আজ হকার উচ্ছেদ করবে সুভাষ চক্রবর্তীর বাহিনী। চলো। গেলাম শ্যামবাজার মোড়। শুরু হল 'অপারেশন সানশাইন'। সাদাত হাসান মান্টোর লেখায় পড়েছি, দাঙ্গার সময় কীভাবে দোকান লুঠ হয় । এবার চোখের সামনে দেখলাম। পান সিগারেটের দোকান লুঠ হত লাগল। চকলেট ইত্যাদিও। দমাদ্দম লাঠির ঘা। একটার পর একটা গুমটি ও দোকান ভাঙছে। কিছু হকারের আর্তনাদ শোনা যাচ্ছে। কিন্তু পার্টির ক্যাডার ও পুলিশের বাধা ঠেলে এগোয় কার সাধ্য। আমার প্রচণ্ড রাগ হচ্ছিল। বলছিলাম, এগুলো কি কমিউনিস্টদের কাজ? শুনে অন্য কাগজের এক নামী সাংবাদিক বললেন, তুমি তো এখন কলেজে পড়াও ভাই। আমাদের সাংবাদিকদের কাজ করতে দাও। আমি কিছুক্ষণ পর আর পারলাম না, টুপি পরে 'অপারেশন সানশাইন' পরিচালনা করছিলেন নেপালদেব ভট্টাচার্য। ছাত্র রাজনীতির সুবাদে চিনতাম। গিয়ে বললাম, এগুলো কী হচ্ছে? এইভাবে লুঠপাট?

নেপালদেবদা কথার উত্তর এড়িয়ে চলে গেলেন । রাত দেড়টা পর্যন্ত ধ্বংসযজ্ঞ দেখে 'আজকাল' দপ্তর হয়ে ঘরে ফিরলাম । সারারাত ঘুমোতে পারলাম না। কিছু একটা করতে হবে। তখন আমার সিদ্ধান্ত ছিল, কোনও সংগঠনে জড়াব না। কিন্তু হকার সংগ্রাম কমিটির নাম জানা ছিল। শক্তিমান ঘোষ তখন কাগজের লোকের কাছে লড়াকু মানুষ হিসেবে পরিচিত। 'অপারেশন সানশাইন'-এর বিরুদ্ধে বিশাল মিছিল বের হল। তাতে যোগ দিলাম। যদিও বেশিরভাগ বড় কাগজে তখন 'অপারেশন সানশাইন'-এর প্রশস্তি চলছে। এই প্রথম জানালা দিয়ে আলো এল। এই প্রথম এমন পরিষ্কার ফুটপাত-- ইত্যাদি বক্তব্য ফলাও করে ছাপা হচ্ছে। তারমধ্যে ভিন্ন সুর 'আজকাল'-এ। হকারদের পক্ষে লেখা ছাপা হচ্ছে। কী করা যায়? কীভাবে পুনর্বাসন হবে? বর্ধমান শহরে আশির দশকে হকার উচ্ছেদের পর কোর্টের কাছে হকার্স কর্নার করে দেওয়া হয়েছিল। লোকে তেমন যেতো না। বিক্রি বাটা হতো না। আমাদের এক অগ্রজ কবির বাবার দোকান ছিল হকার্স কর্নারে। কবি দাদাও বসতেন। সেখানে আড্ডা মারতে যেতাম। দেখেছি, অভিজ্ঞতা সুখের নয়। সিপিআই (এম) নেতা বিমান বসু এক অসাধারণ মানুষ। আমাকে খুব স্নেহ করেন। বিমানদাকে গিয়ে বললাম, উচ্ছেদের পর হকারদের দুর্দশার কথা। বিমানদাকে বললাম, হকারদের নেতা শক্তিমান ঘোষের সঙ্গে যদি একটু কথা বলেন। বিমানদা বললেন, নিয়ে এসো। শক্তিমান ঘোষের সঙ্গে বিমানদার বৈঠক হলো আলিমুদ্দিন স্ট্রিটে। এরপর সরকারের মনোভাব বদলাল। আবার বসতে শুরু করলেন হকাররা। কিন্তু 'অপারেশন সানশাইন'-এর পর কলকাতার গরিব সুবিধাবঞ্চিতদের মধ্যে বামফ্রন্ট সরকারের জনপ্রিয়তা কমল। স্থায়ী ক্ষত। যা আজও নিবারণ হয়নি। এরপর শিয়ালদহ লোরেটো স্কুলে তিনদিন ধরে সর্বভারতীয় হকারদের কর্মশালা। সিস্টার সিরিল একজন অসাধারণ মহিলা। তিনি প্রচুর সহায়তা করেন। শক্তিমান ঘোষের সাংগঠনিক দক্ষতায় তা কর্মশালা খুব ভালোভাবে হলো। এরপর এল উচ্ছেদ বিরোধী আন্দোলন। ২০০১-০২ এ শহর সুন্দর করতে হবে বলে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের সরকার বস্তি উচ্ছেদ করতে লাগলেন। টালিগঞ্জ মেট্রো সম্প্রসারিত হবে বলে টালিগঞ্জ এলাকায় উচ্ছেদ হলো। নারকেলডাঙা খালপাড়ের বসতি পুড়িয়ে দেওয়া হলো। এর বিরুদ্ধে হকার সংগ্রাম কমিটির দপ্তরে বসে গড়ে তোলা হল উচ্ছেদ বিরোধী কমিটি। যৌথ আন্দোলন। ছয়জন আহ্বায়ক সিপিআই (এমএল) লিবারেশনের প্রয়াত নেতা অধ্যাপক অরিজিৎ মিত্র, এস ইউসিআইয়ের প্রয়াত নেতা বিধান চট্টোপাধ্যায়, গৌতম সেন, শক্তিমান ঘোষ ও আমি আহ্বায়ক। আরেকজন ছিলেন। নাম মনে পড়ছে না। চাঁদা তোলা হল। অরিজিৎ মিত্র প্রেসিডেন্সি কলেজে এলেন। ঘুরে ঘুরে সহকর্মীদের কাছে চাঁদা নিলাম। বহু সহকর্মী পাশে দাঁড়ালেন। ছয় হাজার টাকার মতো চাঁদা উঠল। আরও সহায়তা এলো। টালিগঞ্জ এলাকায় উচ্ছেদ হওয়া মানুষদের জন্য যৌথ রান্নাঘর চালু হল। এর আগে আমাদের সংগঠন ভাষা ও চেতনা সমিতি হকার সংগ্রাম কমিটির সঙ্গে যৌথভাবে মুর্শিদাবাদে বন্যাত্রাণে কাজ করেছে। ২০০১ এ ক্লিন্টন এলেন ভারতে। শিয়ালদহে বিরাট জমায়েত হলো। ১৯৭৭ এর এই প্রথম সিপিএমের লোকরাও নকশাল ও এস ইউসিআইয়ের সঙ্গে সভায় যোগ দিলেন। বক্তব্য পেশ করলেন গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সঙ্ঘের সম্পাদক ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। সবমিলিয়ে ২৫ টির বেশি সংগঠন। হকার সংগ্রাম কমিটি এবং ভাষা ও চেতনা সমিতি তাদের অন্যতম। ২০০১ এ একটা ঘটনা ঘটে। গড়িয়াহাট এলাকায় 'অপারেশন সানশাইন'-এর বর্ষপূর্তির প্রতিবাদ মিছিল বের হয়। আমি, শক্তিমানদা ও এক প্রাক্তন নকশাল বিপ্লবী হাঁটছি। কথায় কথায় আমি বলে ফেলি, বামফ্রন্টের এক শাসককে সিআইএর লোক বলে মনে হয়। এর ঘণ্টাখানেক পর একজায়গায় গিয়ে শুনি, কথাটা চাউড় করে দিয়েছেন সেই প্রাক্তন বিপ্লবী নেতা। যাইহোক হকার সংগ্রাম কমিটি ও শক্তিমান ঘোষের কাছে ভাষা ও চেতনা সমিতির ঋণ অনেক। ১৯৯৯ থেকে সারারাত বাংলাভাষা উৎসব শুরু হয় রবীন্দ্রসদন চত্বরে। ভাষা ও চেতনা সমিতি উদ্যোগে। ১৯৫২-র ভাষা

আন্দোলনের শহিদ স্মরণে। ২০০০ খ্রিস্টাব্দে নবজাগরণ, ভাষা শহিদ স্মারক সমিতি যোগ দেয়। এছাড়াও আমি জেলার বহু সংগঠনকে যুক্ত করার চেষ্টা করি। বিরাটির এলিভেশন, সল্ট লেকের আভোগ, নব ব্যারাকপুরের মানিকদা অধীরদা প্রেমানন্দদাদের সংগঠন এদের অন্যতম। ডায়মন্ডহারবার থেকে ভাষা ও চেতনা সমিতির ২০০র বেশি সমর্থক এসেছিলেন। হাজার হাজার মানুষ। এত দর্শক শ্রোতা আর কখনও রবীন্দ্রসদন চত্বর এলাকায় আগে বা পরে দেখিনি। এখন সারারাত থাকবেন মানুষ। খাবেন কী? 'নবজাগরণ'-এর রঞ্জন সেনগুপ্ত নিয়ে এলেন ভজহরি মান্না-র দোকান। ২৫ টাকা করে ভাত মাছ তরকারি। ২৫ টাকা দিয়ে তো সবাই খেতে পারবেন না। শক্তিমান ঘোষকে বললাম। একটা রুটি আলুর দমের দোকান আরেকটা মাছ ভাতের। দশ টাকায় ছটা রুটি আর আলুর দম। ১০ টাকায় পেট চুক্তি মাছ ভাত।

সমগ্র প্রাণীজগত বিষয়ে মানব সচেতনতার গুরুত্ব

লক্ষণ ভট্টাচার্য

'বঙ্গ আমার ধাত্রী আমার জননী আমার আমার দেশ, কেন গো মা তোর শুষ্ক বদন, কেন গো মা তোর রুক্ষ বেশ'

এত সৌন্দর্য এই মহান পৃথিবীতে কেন আমাদের রুক্ষ বদন রুক্ষ কেশ, তাই নিয়ে সামান্য দু চার কথা বলতে চাই। মানুষ ভাবে শুধু কোনো উপায়ে জীবনটাকে কাটিয়ে দেব। কিন্তু এই জীবন কাটাবার মধ্যে দীর্ঘ কয়েক দশক অতিক্রম করতে হয়। এই অতিক্রমের মূল যে কারণ সেটা কিন্তু প্রকৃতির উপর নির্ভর করে। প্রকৃতির ভারসাম্যটা কী? গাছ। হ্যাঁ সত্যিই গাছই প্রত্যেকটি মানব তথা জন্তু জানোয়ার, পশু, পাখি এমন কি মাছ, শামুক, গেঁড়ি, ঝিনুক ইত্যাটি সকল প্রাণীকে অক্সিজেন জুগিয়ে যায়। কিন্তু বর্তমান সমাজটা অতীত থেকে কিছুটা হলেও আলাদা হয়ে গেছে। কারণ, কংক্রিটের মোড়কে মুড়ে গেছে সারা দেশ তথা গ্রাম বাংলাও। বহুতল আর চার দেওয়ালের মধ্যে আমরা আবদ্ধই হয়ে পড়েছি। তাই প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে উপভোগ করতে ভুলেই গেছি। এই লেখার শুরু থেকে অতীতে কখনই আমি গবেষক ছিলাম না। কিন্তু এটুকু অভিজ্ঞতার নিরীখে আমি বলতে পারি ৬৫ থেকে ৭০ শতাংশ মানুষই আজ রোগাক্রান্ত। তার একমাত্র কারণ এ.সি. কুলার বা তীব্র গতীতে চলা পাখা। গাছের হাওয়া আমারা খুব একটা খাই না। কারণ এ মহান ভূমিতে -গাছ নামক প্রাণিটি বিলুপ্ত হতে বসেছে। তাই বলি বন্ধু, এই অবাঞ্ছিত মানুষটির লেখা একটু পড়ুন। গাছের হাওয়া গায়েতে লাগান সঙ্গে নিজেকে সুস্থ ও স্বাভাবিক করে তুলুন। একটি গাছ লাগান। গাছকে কেটে শোভা বর্ধনের কোন আবশ্যকতা আছে বলে আমার মনে হয় না। তাই বলি গাছকে বাঁচিয়ে রাখুন। এই গাছই খাদ্যের মূল কান্ডারী। গাছ ছাড়া সমস্ত কিছুই ছাড়া। গাছ কে লাগান। সঙ্গে বিষন ভাবে যে পরিবেশ দুষন হচ্ছে সেটাকে রক্ষা করার জন্য পলিথিন বা প্ল্যাস্টিক এটাকে বর্জন করুন। আপনাদের সঙ্গে যারা আছে, প্রত্যেককে গাছের বিষয়ে অবহিত করুন। প্লাস্টিককে বর্জনের কথা বলুন। এটাই হবে জীবনে বাঁচার মূল সত্যতা। এখন তো সকালে উঠে ব্রাশ করতে করতে বাজার করে বাড়ীতে ফিরি, হাতে থাকে না ব্যাগ। চারখানা পলিথিন, আলু, মূলো, কলা, মাছ, মাংস, মুদিখানার বাজার। সবই আসে ঐ পলিথিন ব্যাগে। বাড়ীতে ঢুকে সেই পলিথিন ফেলি আমারা হয় কোনো জলাশয়ে না হয় বাড়ীর সামনের ড্রেনে। এটা এক অভুতপূর্ব পরিবেশ দূশন। অল্প বিস্তর জল হলে ড্রেনের জল নিজের ফ্লোতে আর বহিতে পারে না। তখনই উঠে যায় রাস্তায়। শুরু হয়ে যায় হৈ চৈ চেঁচামিছি, আর রাস্তা পাড়াপাড় করা যায় না। পথ চলতি মানুষদের হয় দূর্ভোগ। তৎক্ষনাৎ চলে যাই কোন আধিকারিকের কাছে অথবা দুরবর্তী কোন আধিকারিককে লিখে বা মুখে বলে জানাতে হয়। কিন্তু আমরা জেনেশুনে করে আছি ভুল। বাজারের ব্যাগ বাড়ীতে থেকে নিয়ে বেড়োলেই এই দূর্ভোগ হয়ত পোয়াতে হয় না। তাই বলি প্ল্যাস্টিককে ভীষন ভীষন ভাবে বর্জন করুন আর গাছকে লাগান। এখন একটা রেওয়াজ দেখা যায়, হোটেল বা খাবারের দোকানে বা চায়ের দোকানে ভাত, সবজি, ডাল, মাছ, মাংস সব কিছুই সেই প্ল্যাস্টিকের মধ্যেই বহন করা হচ্ছে। এই গরম খাদ্য দ্রব্য দুষিত প্ল্যাস্টিকে গরম খাবারে মিশে যাচ্ছে। সেটাই আমরা নির্বিকারে খেয়ে যাই। চায়ের দোকানে চা গরম সেটাও প্ল্যাস্টিকে বহন হচ্ছে। এ বড় অদ্ভুত ব্যবস্থা ধীরে ধীরে শরীরে ক্ষয় নেবে আসছে। এসব দেখেও অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে যখন কোন সচেতনার মহড়া অথবা পথসভায় আলোচনা হয়। সেগুলোকে কর্নপাত করেনা। তাই মানুষের কাছে আমার আকুল আর্তি আপনারা গাছকে লাগিয়ে প্রকৃতিক ভারসাম্য কে বজায় রাখুন। প্ল্যাস্টিককে পুরোপুরি ভাবে নির্মূল করুন।

আর নয় অঙ্গার
হকার-কারিগরের জীবন-জীবিকার প্রশ্ন

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়াদের বিক্ষোভ

কয়লা দীর্ঘদিন ধরে ভারত বিদ্যুৎ তৈরি করতে জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার হচ্ছে। ভারত আজ বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম কয়লা ব্যবহারকারী দেশ। এখানে এখনও প্রায় ৭০% বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয় কয়লা পুড়িয়ে। বিপুল পরিমান কয়লা পুড়িয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন নিয়ে দেশের নীতিনির্ধারকদের যুক্তি, উন্নয়ন এবং বিদ্যুৎ ক্ষেত্রে আত্মনির্ভরতার জন্য কয়লা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কাঁচামাল; এবং কয়লা এখনও শস্তায় বিদ্যুৎ উৎপাদন করার বাহন। কিন্তু কয়লা পুড়িয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন করায় ভারতজুড়ে শুধু নয় বিশ্বজুড়ে গভীর সংকট তৈরি হচ্ছে। আপাতত এই প্রবন্ধে আমাদের আলোচ্য ভারতে কয়লা পোড়ানর ফলে হকার কারিগরদের হীবনেনেমে আসা সঙ্কট। মাথায় রাখতে হবে বিপুল পরিমান কয়লা পোড়ানোর ফলে কেবল জলবায়ু সংকট এবং পরিবেশ দূষণই ঘটে না, এর পাশাপাশি লক্ষ লক্ষ শ্রমিক, কারিগরের জীবিকায় সংকট তৈরি করে; বিশেষ করে ফুটপাথে বসে যে সব হকার জীবিকা নির্বাহ করে শহরের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষকে উপযুক্ত মূল্যে যাপনের অধিকাংশ দ্রব্য হাতে তুলে দেন, তাদের জীবন সংকটের মুখে পড়ছে, গ্রামে-গঞ্জে বসে যে কারিগর পরম্পরার দ্রব্য তৈরি করছে, সে পরিবেশ দূষণের ফলে তার উৎপাদনের উপকরণ পাচ্ছেন না।

কয়লা থেকে দূষণ সৃষ্টির মানবিক মূল্য

প্রতি সেকেন্ডে টন টন কয়লা পুড়িয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন করার উদ্যম হল ভারত জোড়া বায়ু দূষণের একক বৃহত্তম উৎস। কয়লা পুড়িয়ে যে কালো গ্যাস বায়ুমণ্ডলে ছাড়া হয়, তাতে জুড়ে থাকে নানা বিষাক্ত গ্যাস। আমরা প্রতি সেকেন্ডে এই গ্যাস নিশ্বাসের মাধ্যমে আমাদের দেশে প্রবেশ করাই। এর ফলে আজ অধিকাংশ মানুষ গুরুতর শ্বাসের কষ্টে, হৃদরোগে এবং অন্যান্য রোগজনিত অসুস্থতায় ভুগছেন, অকালে মৃত্যু বরণ করছেন। ফুটপাথের বিক্রেতা এবং ফেরিওয়ালারা প্রতিদিন ১০-১৪ ঘন্টা জনবহুল মোড়ে, বাজারে, গলিতে, বাস স্টপে কাটাতে বাধ্য হল, তারা প্রথমত গাড়ি থেকে বেরিয়ে আসা ধোঁয়ার দূষণে, একই সঙ্গে বাতাসে মিশে থাকা কয়লা পোড়ানো নির্গত ধোঁয়ার বিষে অনিবার্যভাবে আক্রান্ত হচ্ছেন। পরিবেশ দূষণের ফলে জলবায়ুতে বিপুল বিপর্যয় নেমে আসছে। ক্রমবর্ধমান তাপপ্রবাহ, বিপুল বন্যা এবং অনিয়মিত বৃষ্টিপাত - সবই কয়লা নির্গত গ্যাসের ধাক্কায় ঘটছে। অস্বীকার করার উপায় নেই জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জুড়ে আছে কয়লা পোড়ানোর পরে তৈরি হওয়া দূষণ। এই দুষণ অপ্রাতিষ্ঠানিক খেটে খাওয়া মানুষ, যেমন হকার, যেমন কারিগরদের সরাসরি হুমকির মুখে ফেলছে। হঠাৎ বন্যায় হকারের দোকানের মালপত্র ভেসে যায়, অতি বৃষ্টিতে কাজের দিন নষ্ট হয়; ফুটপাথের দোকানে খাওয়ার, ফল, জামাকাপড়, অন্যান্য পণ্য বিক্রয় করা হকার গ্রীষ্মের তাপে অসুস্থ হয়ে পড়ে তার বড় লেখা আমরা এর আগের সংখ্যায় লিখেছি। ছোট ছোট পরিবেশ পরিবর্তনে প্রকৃতি ধাক্কা আমাদের হকাদের ওপর, কারিগরদের ওপর এসে পড়ে। কখনও তাদের প্রাণ যায়, কখনও বিপুল ক্ষতির মুখোমুখি হতে হয়, প্রক্রিতি জীবন-জীবিকার উপকরণ ছিনিয়ে নেয়। সব থেকে বড় কথা যেটা দেখা যায় না প্রতি সেকেন্ডে সে ভেতরে ভেতরে অসুস্থ হতে থাকে পরিবেশ দূষণের প্রভাবে। যার অর্থ বিশাল ক্ষতি - কারণ বেশিরভাগ হকার, কারিগরের সামাজিক সঞ্চয়, সামাজিক সুরক্ষা বা বীমা বলে কিছুই প্রায় থাকে না।

হকার, কারিগর কেন গুরুত্বপূর্ণ

কারিগর বা হকারের ভারতের অর্থনীতিতে প্রান্তিক সমাজ নন বরং তারা অর্থনীতির মেরুদণ্ড। শুধু হকারের সংখ্যা সারা দেশে ১ কোটিরও বেশি, আর পরম্পরার কারিগরদের সংখ্যা শুধু

কলকাতায় কয়লা ভবনের সামনে হকার সংগ্রাম কমিটির বিক্ষোভ

পশ্চিমবাংলায় ৬০ লক্ষ। এরা দেশের হাট, বাজার ব্যবস্থা নিজেদের উদ্যোগে সক্রিয় রাখে, খাদ্য নিরাপত্তা তৈরি করেন, সাশ্রয়ী মূল্যের পণ্য, জীবন জীবিনার উপকরণ সরবরাহ করেন এবং গ্রামের ছোট ছোট কারিগরদেরর উৎপন্ন দ্রব্য, কৃষকদের চাষ উৎপাদন গ্রামে বাজারে বিক্রি করে। হকারেরা শহরের, আধা শহরের দিন আনি, দিন খাই মানুষের জন্য সাশ্রয়ি দামে বিপুল বৈচিত্রের খাবার সরবরাহ করে, চাষী কারিগরদের উৎপন্ন মৌসুমী পণ্য বিক্রি করে এবং গ্রাম, শহরে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র চলাচলের সহায়তা করে। তবুও হকাররা যেমন রাজনৈতিক চাপে পণ্য বিক্রির জন্য স্থিতিশীল পরিবেশ পায় না, তেমনি তারা বিষমুক্ত শ্বাস-প্রশ্বাসযোগ্য বাতাস, সহনীয় তাপমাত্রা এবং কার্যকর স্থানীয় অর্থনীতিও পায় না। কয়লা থেকে নির্গত দূষণ এই প্রতিটি আরও খারাপ করে। বিষাক্ত বাতাস ক্রেতাদের দোকানে আসা কমিয়ে দেয়। আমরা এর উদাহরণ বিভিন্ন শহরে দেখেছি। এই প্রবন্ধটা যখন আমরা লিখছি, সে সময় কলকাতা সহ আশেপাশে বিপুল বর্ষায় হকারদের প্রভূত ক্ষতির সম্মুখীন করেছে; তার কয়েক দিন পরেই জেলাগুলো সহ উত্তরবঙ্গে ব্যাপক, ভয়াবহ বন্যা একের পর এক বাজার হাট উৎপাদন কেন্দ্র মানুষের ঘরবাড়ি তাদের জীবিকার উপকরণ ধ্বংস করেছেও। এবং যখন সরকার কয়লার জন্য ভর্তুকি দেওয়ার জন্য দুষ্প্রাপ্য সম্পদ ব্যয় করে, তখন তারা এমন সামাজিক পরিষেবাগুলিকে ক্ষুধার্ত করে তোলে যা সংকটে অপ্রাতিষ্ঠানিক শ্রমিকদের আরও সহায়তা করতে পারত।

কয়লা পোড়ানো বন্ধ করা কেন গুরুত্বপূর্ণ

কয়লা পুড়িয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন বন্ধ করারা দরকার সাধারণ মানুষের জীবন আরও সুগম করতে। যেসব গোষ্ঠী কয়লা পুড়িয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন বন্ধ হলে সবচেয়ে বেশি সরাসরি উপকৃত হবে তারা হল হকার, কারিগর, ফেরিওয়ালা, দিন আনি দিন খাই মানুষজন। সমস্যা হল কয়লা পুড়িয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদনে সব সবচেয়ে বেশি লাভবান হয়েছে পুঁজিপতি, ধনবান আর ভদ্রবিত্ত; কিন্তু হকার কারিগর চাষী স্বাস্থ্য হারিয়েছে, আয় হারাচ্ছে এবং তারা ভবিষ্যতে আরও বড় ক্ষতির মুখোমুখি হতে যচ্ছে।

দক্ষিণ দিনাজপুরে জ্ঞানগঞ্জ, বঙ্গীয় পারম্পরিক কারু ও বস্ত্র শিল্পী সঙ্ঘের বিক্ষোভ

তহবিল গড়ে তোলা জরুরি

এই পরিবর্তনকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার জন্য, ভারতের প্রয়োজন: ১) নবায়নযোগ্য জ্বালানিতে ব্যাপক বিনিয়োগ - দূষণ হ্রাস করে এবং জলবায়ু স্থিতিশীল করে। ২) নগর অভিযোজন ব্যবস্থা - তাপ আশ্রয়, বন্যা-প্রতিরোধী ভেন্ডিং জোন এবং অনানুষ্ঠানিক কর্মীদের জন্য পরিষ্কার জলের অ্যাক্সেস। ৩) সামাজিক সুরক্ষা - অসামঞ্জস্যপূর্ণ ঝুঁকির সম্মুখীন রাস্তার বিক্রেতাদের জন্য আয় সহায়তা, স্বাস্থ্যসেবা এবং জলবায়ু বীমা। ৪) পরিকল্পনায় অংশগ্রহণ - হকারদের কণ্ঠস্বর অন্তর্ভুক্ত করতে হবে যাতে নীতিমালাগুলি সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্তদের বাস্তবতা প্রতিফলিত করে। ভারতের অগ্রগতির প্রতীক হিসেবে কয়লাকে প্রায়শই উপস্থাপন করা হয়, কিন্তু বাস্তবে, এটি বৈষম্য এবং নিরাপত্তাহীনতাকে আরও গভীর করছে। লক্ষ লক্ষ রাস্তার বিক্রেতা এবং হকারদের কাছে, কয়লা উন্নয়ন নয় - এটি ধ্বংস। নবায়নযোগ্য শক্তির দিকে একটি রূপান্তর কেবল প্রযুক্তির বিষয় নয়, এটি ন্যায়বিচারের বিষয়। এটি নিশ্চিত করার বিষয় যে যারা আপনার রাস্তার মোড়ে ফল বিক্রি করে, রাস্তার ধারে খাবার রান্না করে এবং প্রতিটি ভারতীয় শহরে জীবন ফিরিয়ে আনে তারা কাজ করতে পারে, বাঁচতে পারে এবং মর্যাদার সাথে শ্বাস নিতে পারে।

একটি ন্যায্য ভবিষ্যৎ সম্ভব

কয়লা পুড়িয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন অতীত - এই পদ্ধতি নোংরা, মারাত্মক ক্ষতিকর এবং অন্যায্য। ভারতের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে দূষণমুক্ত বিদ্যুৎ, শ্রমিকদের জন্য ন্যায়বিচার, মানুষ এবং গ্রহের প্রতি শ্রদ্ধা দেখানোর ওপর। রূপান্তরের জন্য তহবিল দিন। লাভের আগে মানুষকে রাখুন। ভারতের ভবিষ্যৎ কয়লার ওপর নির্মিত হতে পারে না। এটি অবশ্যই পরিষ্কার শক্তি, স্থিতিশীল শহর এবং শ্রমজীবী মানুষের অধিকারের ওপর নির্মিত হতে হবে।

কেন হকারিতে এলাম

বাবুসোনা মণ্ডল

আমি বাবুসোনা মণ্ডল। আমি সেক্টর ফাইভে ২০০৬ সাল থেকে হকারি করছি। আগে আমি একটা বেসরকারি সংস্থায় কাজ করতাম। সেখানে মাইনে ছিল কম। সেইজন্য আমি ঠিক করলাম ফুটপাতে যদি একটা ছোট চায়ের দোকান খুলি সেখান থেকে আমার যদি রোজগারটা হয়। সেই আশাতেই আমি ফুটপাতে হকারি করতে শুরু করলাম।

তখন কোনো ইউনিয়ন ছিল না। সংগঠন ছিলনা। হকাররা একজোট ছিল না। যে যার মত দোকান চালাত। যে যার খুশি মত আসত, বসত, দোকানদারি করত, চলে যেত। এই অবস্থায় আমার মনে হল হকারদের একটা ইউনিয়নের প্রয়োজন আছে। ইউনিয়ন না থাকলে পুলিশ প্রশাসনের অত্যাচার, উচ্ছেদের বিরুদ্ধে আমরা এক হতে পারব না। কোনও হকার বিরোধী প্রশাসনিক পদক্ষেপকে আটকাতে পারব না। ইউনিয়ন হলে আমরা একসাথে একটা ছাতার তলায় থেকে লড়াই করতে পারব।

২০১৬ সালে আমাদের ইউনিয়ন তৈরি হয়। নাম হয় সল্টলেক সেক্টর ফাইভ হকার ওয়েলফেয়ার এ্যাসোসিয়েশন। তখন আমরা হকার সংগ্রাম কমিটির নাম জানলাম। যার জেনারেল সেক্রেটারি হকার নেতা শক্তিমান ঘোষ। এই সংগঠন হকারদের জন্য কাজ করে। তাদের ওপর যে কোনও অত্যাচার অথবা হকার উচ্ছেদ বিরুদ্ধে লড়াই-এর কথা আমরা শুনেছিলাম। এবার আমরা হকার সংগ্রাম কমিটির সাথে যোগাযোগ করি এবং আমাদের ইউনিয়নকে যুক্ত করে যৌথভাবে হকার সংগ্রাম কমিটির সাথে আমাদের লড়াই শুরু করি।

হকাররা মানুষদের পরিষেবা দেয়। ফুটপাত বা রাস্তার কোন অন্ধকার জায়গায় হকারদের থাকার জন্য মানুষ সেখানে হাঁটাচলা করতে অসুবিধা বোধ করে না। এমনকি কোনও মানুষের বিপদে হকাররাই প্রথমে দৌড়ে যায় উপকার করতে। যেহেতু আমরা আই-টি সেক্টর অঞ্চলে হকারি করি সেখানে এক থেকে দেড় লক্ষ মানুষ যাতায়াত করে। তাদের সকালের টিফিন থেকে শুরু করে দুপুরে খাওয়া, এছাড়া চা-সিগারেট সব কিছুতেই তারা আমাদের এই হকারদের ওপরেই নির্ভরশীল। একই ভাবে আমরাও জীবিকার প্রয়োজনে তাদের উপর নির্ভরশীল। এভাবেই আমাদের ব্যবসা যা হকারি, তা চলে।

২০১৮ সালে ২৬ শে জুলাই আমাদের সেক্টর ফাইভে নোটিশ আসে, এই অঞ্চলে হকার উচ্ছেদের। যেখানে বলা হয় হকার থাকা চলবেনা। এরকম কিছু নির্দেশিকা জারি হয়। তখন সেক্টর ফাইভের সকল হকার ভাই, হকার সংগ্রাম কমিটির নেতৃত্বে ও পরামর্শে আন্দোলনে নামি। আমরা সেক্টর ফাইভের সমস্ত হকার আন্দোলনে রাস্তায় নামি। আমরা একদিন দোকান বন্ধ রাখি, তারপর হাইকোর্টে কেস করি। আমাদের জয় হয়। নির্দেশ জারি হয়, পুনর্বাসন ছাড়া কোনও হকার উচ্ছেদ হবে না।

আমরা ২০১৮ থেকেই হকার সংগ্রাম কমিটি ও ন্যাশনাল হকার ফেডারেশনের সাথে যুক্ত হই। সারা ভারতে এই সংগঠন আছে। এবং সারা ভারতের হকারদের যে কোনও সমস্যা, বিপদে, উচ্ছেদের বিরুদ্ধে তারা পৌঁছে যায়। হকারদের সুরক্ষা আইনে (২০১৪) যে সব সুবিধা ও কাজকর্ম আছে সেইসব অধিকার রক্ষায় সংগঠন সবসময় তাদের পাশে থাকে।

২০১৪ সালে হকার আইন তৈরী হয়েছে। হকারদের আইনে বলা হয়েছে পুনর্বাসন ছাড়া তাদের তুলে দেওয়া যাবে না। এছাড়া হকারদের পিএম স্বনিধি যোজনা হয়েছে। এবারের কেন্দ্রীয় বাজেটে বলা হয়েছে যে, হকারদের ৩০,০০০ টাকার ক্রেডিট কার্ড দিতে হবে। এই সমস্ত অনেক সুযোগসুবিধা এখন পাওয়া যাচ্ছে। বর্তমানে আমরা নির্বিঘ্নে ব্যবসা, হকারি করছি। হকারদের নবদিগন্ত থেকে নতুন লোহার স্টল বানিয়ে দিচ্ছে। আমাদের জলের ব্যবস্থা, কারেন্টের ব্যবস্থা নবদিগন্ত থেকে করে দেবে বলেছে। এছাড়া আমাদের ভেন্ডিং সার্টিফিকেট দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে। তাই এখন আমরা হকাররা এখানে ভালভাবেই ব্যবসা করছি। এছাড়া আমরা ইউনিয়ন থেকে অনেক সুযোগ সুবিধে পাচ্ছি। যে টাউন ভেন্ডিং কমিটি তৈরী হয়েছে সেখানেও হকারদের সমস্তরকম সুবিধা অসুবিধা নিয়ে আলোচনা হয়। সম্মিলিত সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে যে সিদ্ধান্ত হবে তাই আমাদের করতে হবে।

প্রভিশনাল টাউন ভেন্ডিং কমিটিতে ৫ জন হকার প্রতিনিধির মধ্যে মহিলা সহ আমরা ৪ জন প্রতিনিধি আছি।

পিএম স্বনিধি প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের এমসিডি, পুলিশ উচ্ছেদ করেছে : অনিল বকশী

সরাই কালেখান রেলওয়ে রোডে প্রায় ৪০০ হকারকে দিল্লি পৌর নিগম আর দিল্লি পুলিশ উচ্ছেদ করেছে। অথচ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি হকাদের আত্মনির্ভর করতে ৭৩৪২ কোটি টাকা পিএম স্বনিধি প্রকল্পে অনুমোদন দিয়েছেন। হকার সংগঠনের দাবি, দিল্লি পৌর নিগম হকারদের ঋণ দিলেও তাদের উচ্ছেদ করা হচ্ছে। এই রাস্তায় ই-রিকশা, অটো জ্যাম করে। ন্যাশনাল হকার ফেডারেশন এই উচ্ছেদের তীব্র প্রতিবাদ জানায়। ন্যাশনাল হকার ফেডারেশনের জাতীয় সম্পাদক অনিল বকশী প্রধানমন্ত্রী ও নগর উন্নয়ন মন্ত্রী এবং মুখ্যমন্ত্রীর কাছে স্ট্রিট ভেন্ডারদের উচ্ছেদ বন্ধের দাবি জানান। তিনি বলেন আত্মনির্ভর প্রকল্প সার্থক ও সফল করতে হলে এই ধরনের কাজ বন্ধ করতে হবে। যেসব হকার উচ্ছেদ করা হচ্ছে, তারা সবাই পিএম স্বনিধি প্রকল্পের সুবিধাভোগী এবং তাদের সার্ভেও হয়েছে। সবার কাছেই ভেন্ডিং সার্টিফিকেট রয়েছে।

হকার সংগ্রাম কমিটির মুখপত্র এই সময় মানবজমিন তুলে দেওয়া হল বিধায়ক, মেয়র পারিষদ দেবাশিস কুমারের হাতে তুলে দিলেন হকার নেতা শক্তিমান ঘোষ, দেবাশিস কুমার, রেখা মারিক

ভবতোষ সরকারের **সম্পাদনায়** হকার সংগ্রাম কমিটির মুখপত্র 'এই সময় মানবজমিন' ১৬/১৭, কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০০৯ থেকে ২০২৫-এর আগস্ট সংখ্যা প্রকাশিত হল। **সম্পাদকমণ্ডলী** শক্তিমান ঘোষ, মুরাদ হোসেন, উজ্জ্বল সেনগুপ্ত, সুশোভন চ্যাটার্জী (সংকেত), সোনালী মুর্শেদ, বাবুসোনা মণ্ডল, কুশল, অত্রি ভট্টাচার্য, সুবলচন্দ্র সরদার, অনিতা দাস, রেখা মারিক, বিশ্বেন্দু নন্দ